গোর্খাল্যান্ড কী শ্রমিক শ্রেণীর দাবি?

সুশোভন ধর

দার্জিলিং আর একবার জ্বলে উঠেছে! গোর্খাল্যান্ডের দাবীতে আন্দোলনের এই তীব্রতা, সাম্প্রতিক অতীতে খুব একটা দেখা যায় নি। রাস্তায় আরও বেশি বেশি করে সাধারণ মানুষের ঢল নামছে এবং এই মুহূর্তে তাদের হাতেই বিক্ষোভের রাশ। এবারের আন্দোলনের আওয়াজ আর এই রাজ্য বা দেশের মধ্যে সীমিত নয়, আন্তর্জাতিক মহলেও ছড়িয়ে পড়েছে।

যদিও বিষয়টার সূত্রপাত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বাংলাকে দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে রাজ্যের সমস্ত জনগোষ্ঠীর ওপর চাপিয়ে দেওয়াকে কেন্দ্র করে, কিন্তু এই আন্দোলন শুধু ঐ সিদ্ধান্তের বিরোধিতায় থেমে থাকে নি। বরং এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আরও বড় স্বতস্ফুর্ত আন্দোলন গড়ে উঠেছে আলাদা রাজ্যের দাবিতে। প্রথম দিকে শান্তিপূর্ণ অবস্থান, ইত্যাদির মাধ্যমে শুরু হলেও ক্রমশ আন্দোলন জঙ্গি রূপ নিতে শুরু করে এবং পুলিশের গুলিতে বেশ কয়েকজন আন্দোলনকারীর মৃত্যু ঘটে। পাহাড়ে এর মধ্যে ইন্টারনেট সহ বেশ কিছু পরিষেবা বন্ধ এবং বহু জায়গা থেকে কার্যত জরুরী অবস্থার ছবি ভেসে আসছে। যদিও এই ধরণের জঙ্গি আন্দোলন এই প্রথম নয়। এর আগে ৮০-এর দশকের আন্দোলনে সহস্রাধিক মানুষ প্রাণ দিয়েছিলেন।

গোর্খা জাতিসত্তার বামপন্থী ইতিহাস

এই আন্দোলনের পক্ষে-বিপক্ষে যারা মননশীল সওয়াল করছেন তারা প্রায় প্রত্যেকেই তাদের আলোচনার কেন্দ্রে গোর্খা জাতিসত্তার প্রশ্নটিকে রাখছেন। গোর্খা জাতিসত্তার প্রশ্নটা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ কারণ দার্জিলিং কোনকালেই বঙ্গদেশের "অবিচ্ছেদ্য" অংশ ছিল না। দার্জিলিং যে ঠিক কার অবিচ্ছেদ্য অংশ এ নিয়ে নানা বিতর্ক বা জটিলতা থাকতেই পারে, কিন্তু তা বলে এই অঞ্চলের কোন নৈতিক দাবি বাঙ্গালি জাতির থাকতে পারে না। এর আগে ১৮৩০-৪০ সাল থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এখানে শাসন চালালেও বা তারও আগে দার্জিলিং নেপাল বা সিকিমের অংশ হলেও ভারতের স্বাধীনতার পরেই এই পাহাড়ি জেলাকে পশ্চিমবঙ্গের সাথে যুক্ত করা হয়। অতএব বাঙ্গালির দার্জিলিংকে পশ্চিমবঙ্গের 'অবিচ্ছেদ্য' অংশ হিসাবে দেখতে চাওয়ার দাবি ধোপে টেকে না।

দার্জিলিং এর আলাদা প্রশাসনিক মর্যাদার দাবিতে আন্দোলনের ইতিহাস একশো বছরের ওপর পুরনো। ১৯০৭ সালে জনৈক সোনাম ওয়াঙ্গেল লাডেনলা এই মর্মে দাবিপত্র দেন। তিনি দার্জিলিং পুলিশের অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারিন্টেনডেন্ট হিসাবে অবসর গ্রহণ করেন। পাহাড়ের মানুষ হিসাবে তিনিই

প্রথম এত উচ্চপদে আসীন হন। তার পরে বহু দাবিপত্র, স্মারকলিপি, ইত্যাদি জমা পড়েছে দার্জিলিং-এর স্বায়ত্বশাসনের দাবিতে। ১৯৮০ -এর দশকে এবং ২০০৭ সালে দার্জিলিংকে কেন্দ্র করে আলাদা প্রদেশের দাবিতে আন্দোলন হয়। মজার কথা হোল গোর্খা প্রদেশের দাবির একটা শ্রেণীগত মাত্রা আছে এবং সেই কারণেই এই দাবি ভীষণভাবে বামপন্থী। কিন্তু এ রাজ্যের সংসদীয় বামপন্থীদের দ্বিচারিতার কারণে আন্দোলনের এই দিকটা আজ উপেক্ষিত, অবহেলিত ও বিস্মৃত। ১৯৮০ এর দশকে ও ২০০৭ পরবর্তী সময়ে ক্ষমতাসীন বামফ্রন্টের গোর্খাল্যান্ড আন্দোলনের বিরোধিতা এবং তার ওপর দমন - নিপীড়ন চালানো পাহাড়ের মানুষকে শুধুমাত্র কমিউনিস্ট বিরোধিতার পথে যেতে বাধ্য করে নি, এই আন্দোলনের শ্রেণীগত মাত্রাকে একেবারে পেছনের সারিতে নিয়ে গিয়ে ফেলেছে। এবং, পাহাড়ে সুভাষ ঘিসিং থেকে বিমল গুরুং - সমস্ত নেতৃত্বই শ্রমিকদের বিপুল সমর্থনে নেতা হয়ে উঠলেও কার্যত এই আন্দোলনকে শ্রমিক শ্রেণীর রাজনীতি থেকে কয়েকশো মাইল দূরে নিয়ে গেছেন।

ইংরেজরা এদেশের গরমের হাত থেকে বাঁচার জন্য দার্জিলিংকে গড়ে তোলার কারণেই এই জায়গা সর্বসাধারণের কাছে পরিচিত হয়। কিন্তু বাস্তবে দার্জিলিংকে কেন্দ্র করে চা শিল্পের পত্তন না হলে এর গুরুত্ব এত বাড়ত কী? দার্জিলিং এ প্রথম চা বাগিচার পত্তন হয় ১৮৫৬ সালে। তারপর অতি দ্রুত গোটা দার্জিলিং জুড়েই চা বাগান ছড়িয়ে পড়তে থাকে। কার্সিয়াং এর মকাইবাড়ি, দার্জিলিং এর আলুবাড়ি চা বাগান, টুকভার, সোনাদার নীচে হোপটাউন, ইত্যাদি হল প্রথম দিকের বাগান। এরপর ১৮৫৯ থেকে ১৮৬৪ এর মধ্যে গড়ে ওঠে রংমুক অ্যান্ড সেডার্স, আম্বুটিয়া, মারগারেটস হোপ, ফুবশেরিং, তাকদাহ, স্টাইনথাল, বাদামতাম, ইত্যাদি। ১০ বছরের মধ্যে ৩৯ টা বাগান গড়ে ওঠে, আরও ৫ বছরের মধ্যে ৫৬ টা বাগান এবং ১৯০৫ সালে দার্জিলিং জেলায় ৭৯ টা বাগান তৈরি হয়। চা শিল্পের আরও সম্প্রসারণ ঘটে ১৯১৪ সালে ১৫৬ টা বাগান গড়ে ওঠে এবং ৩০ হাজারের ওপর স্থায়ী ও ১২ হাজার অস্থায়ী শ্রমিক মিলে ৫৪ হাজার একর জুড়ে চা পাতা উৎপাদনে নিযুক্ত থাকেন।

চা শিল্প গড়ে ওঠার সাথে সাথেই, ত্রিশ-চল্লিশ দশক নাগাদ, বামপন্থীরা বিশেষ করে সিপিআই সেখানে চা শ্রমিকদের সংগঠিত করতে থাকে। বিভিন্ন রকমের অর্থনৈতিক দাবিদাওয়া ছাড়াও শ্রমিকদের মধ্যে থেকে নানারকমের রাজনৈতিক দাবি উঠে আসে। এর মধ্যে প্রধান ছিল নেপালি ভাষার স্বীকৃতি। ১৯৫৬ সালের ২৪ শে আগস্ট রাজ্যসভায় এই দাবি তোলেন সত্যেন্দ্র নারায়ণ মজুমদার। তিনি ছিলেন সিপিআই এর দার্জিলিং জেলার সর্বক্ষণের কর্মী। এর আগে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে ব্রিটিশ ভারতের অবিভক্ত বাংলার আইনসভার শেষ নির্বাচনে দার্জিলিং এর আসন সংখ্যা এক থেকে বাড়িয়ে দুই করা হয়। অসংরক্ষিত আসনে গোর্খা লীগ প্রার্থী ডম্বর সিং গুরুং নির্বাচিত হন। অন্যদিকে ১২ টা চা বাগান নিয়ে শ্রমিকদের জন্য সংরক্ষিত আসনে কংগ্রেসের গাগা শেরিং, চা বাগান মালিকদের দাঁড় করানো প্রার্থী এস কে শেরিং এবং সিপিআই এর রতনলাল ব্রাহ্মণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। সি পি আই শ্রমিকদের ১১ দফা দাবি তুলে ধরে নির্বাচনে লড়ে। কোনরকম ঘুরিয়ে ফিরিয়ে "উন্নয়নের" বাণী প্রচার না করে শ্রমিকদের

হয়ে সরাসরি কথা বলার জন্য ৮৫ শতাংশ ভোট পেয়ে জয়ী হন রতনলাল ব্রাহ্মণ। সেই নির্বাচনে কমিউনিস্ট পার্টির মোট ৩ জন জয়যুক্ত হন। রেল শ্রমিকদের জন্য সংরক্ষিত আসন থেকে জ্যোতি বসু, দিনাজপুর থেকে কৃষক নেতা রূপনারায়ণ রায় ও রতনলাল ব্রাহ্মণ। রূপনারায়ণ রায় তেভাগা আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন পরবর্তীকালে তিনি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে গেরিলা বাহিনীরও সংগঠক ছিলেন।

রতনলাল ব্রাহ্মণের নির্বাচনে জয়লাভের ফলে কমিউনিস্ট পার্টির দ্রুত প্রসার ঘটতে থাকে দার্জিলিং এর পাহাড়ে এবং শীঘ্রই পার্টির দার্জিলিং জেলা সম্মেলন হয় জলাপাহাড়ে স্নেহাংশু আচার্যের বাড়িতে। সরোজ মুখোপাধ্যায় ও ভবানী সেন পার্টির বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির পক্ষে ঐ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। সেই সম্মেলনের প্রস্তাবে একথা বলা হয় "জেলা কমিটি যে স্বাধীন ভারতে স্বাধীন গোর্খাস্থানের দাবি সময়ে সময়ে তুলে ধরেছে তা বহাল রাখা হোল এবং পুনরায় ব্যক্ত করা হল।" প্রাদেশিক কমিটির নেতৃত্বের উপস্থিতিতে দার্জিলিং জেলার প্রথম সম্মেলনে গোর্খাস্থানের দাবিতে এই প্রস্তাব গ্রহণ করা থেকে পরিষ্কার যে তা শুধু দলের দার্জিলিং জেলার শাখার অবস্থান ছিল না বরং দলের সামগ্রিক অবস্থান ছিল। এর পর রতনলাল ব্রাহ্মণ ও গণেশলাল সুব্বা (সি পি আই এর তৎকালীন দার্জিলিং জেলা সম্পাদক) সংবিধান সভার কাছে ১৯৪৭ সালের ৬ই এপ্রিল গোর্খাস্থান গঠনের দাবিতে স্মারকলিপি পেশ করেন। স্মারকলিপিতে তাঁরা বিভিন্ন ভৌগোলিক, রাজনৈতিক, ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক, ভাষাগত ও জাতিগত বিষয়ের উল্লেখ করেন। এবং দাবি করেন "অতএব ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি দাবি করছে যে বর্তমান সীমানাগুলোর প্রয়োজনীয় সংশোধনের মাধ্যমে দার্জিলিং জেলা, দক্ষিণ সিকিম ও নেপাল, এই তিন লাগোয়া অঞ্চলকে গোর্খাস্থান নামক একটা অঞ্চলে একত্রিত করতে হবে।" তৎকালীন সি পি আই লেনিনের জাতিগত আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের থিসিস ভারতের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে। এরই অংশ হিসাবে তারা গোর্খাস্থানের দাবি তোলেন। সি পি আই 'বীর গোর্খা' নামে পার্টির কাগজ প্রকাশ করে যার প্রচ্ছদে গোর্খাস্থানের প্রস্তাবিত মানচিত্র ছাপা হয়েছিল। মুশকিল হল যে পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় আসার পর সিপিআইএম এর দ্বিচারিতার ফলে এই ইতিহাস সমসাময়িক ভাষ্য থেকে প্রায় হারিয়েই গেছে।

তারা ক্ষমতায় আসার পরে ১৯৭৮ ও ১৯৮১ সালে বিধানসভায় দার্জিলিং ও তার সংলগ্ন এলাকার জন্য স্বায়ত্বশাসনের প্রস্তাব পাশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেন। দলের সাংসদ আনন্দ পাঠক ১৯৮৫ সালের ৯ই আগস্ট লোকসভায় এই দাবি নিয়ে, বিধানসভার প্রস্তাবের ভিত্তিতে, প্রাইভেট মেম্বার বিল আনেন। কিন্তু বিল নিয়ে বিতর্কের পর তার সমর্থনে ভোট পড়ে ১৭ টা বিপক্ষে ৪৭। এরপরের ইতিহাস অন্য খাতে বয়ে চলে। সুভাষ ঘিসিঙ্গের নেতৃত্বে গোর্খাল্যাণ্ডের দাবিতে পাহাড়ে উত্তাল আন্দোলন এবং সিপিআইএম ও বামফ্রন্টের এর উগ্র বিরোধিতা, পুলিশি নিপীড়ন, বাঙ্গালি জাতীয়তাবাদ উস্কে দিয়ে সস্তার রাজনীতির মাধ্যমে যেনতেন প্রকারেণ ক্ষমতায় টিকে থাকার কৌশল, ইত্যাদির ফলে পাহাড়ের

রাজনীতি অন্য দিকে মোড় নেয়। গোর্খাল্যান্ডের দাবির শুধুমাত্র জাতিগত দিকটা প্রধান থেকে একমাত্র দিক হয়ে ওঠে, প্রায় সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে যায় শ্রেণীগত মাত্রা।

দার্জিলিং এর চা শ্রমিকদের আজকের অবস্থা ও তাদের লড়াই

বর্তমানে দার্জিলিং এ ১৯ হাজার হেক্টর (৪৬, ৯৫০ একর) জুড়ে ৫২ হাজার স্থায়ী শ্রমিক কর্মরত। আরও ১৫ হাজার অস্থায়ী শ্রমিক এই ৮৭ টা বাগানে কাজ করেন, মূলত পাতা তোলার মরশুমে (মার্চ-নভেম্বর)। অনুমান করা হয় যে ২ লক্ষেরও বেশি পরিবার চা শিল্পের সাথে সরাসরি যুক্ত। এই শ্রমিকদের অধিকাংশ মহিলা। বার্ষিক ১ কোটি কিলোগ্রাম চা উৎপন্ন হয় এই বাগানগুলি থেকে যার কেজি প্রতি গড় বাণিজ্যিক মূল্য কমপক্ষে ৭০০ থেকে ৮০০ টাকা । ২০১৪ সালে এক কেজি চায়ের দাম উঠেছিল ১ লক্ষ্য ১২ হাজার টাকা। কিন্তু এখানকার শ্রমিকদের মজুরী অনেক বেড়ে-টেড়ে দৈনিক ১৩২ টাকা ৫০ পয়সা। একই অবস্থা তরাই-ডুয়ার্সেও। অন্যদিকে দক্ষিণ ভারতের চায়ের গড় দাম অত্যন্ত কম। কিন্তু সেখানকার শ্রমিকদের দৈনিক মজুরী - কেরালায় ৩১০ টাকা ০৪ পয়সা, তামিলনাড়ুতে ২৪১ টাকা ৩১ পয়সা এবং কর্নাটকে ২৬৩ টাকা ২৯ পয়সা।

উপরোক্ত তথ্যগুলো থেকে এ কথা পরিষ্কার যে দার্জিলিং এর যে শ্রমিকরা অত্যন্ত দামি চা উৎপাদনের মাধ্যমে দেশবিদেশের মালিক ও অন্যান্য বাণিজ্যিক পুঁজিকে সমৃদ্ধ করেছে সেই তারাই চূড়ান্ত শোষণের শিকার। মজুরী ছাড়া শ্রমিক কল্যাণে অন্যান্য যে আইনকানুন আছে চা বাগানের মালিকরা সেগুলোকে গত শতকের শেষদিক থেকে নির্দ্বিধায় বাজে কাগজের বাক্সে ফেলে দিয়েছেন। অন্যদিকে শ্রমিকদের ওপর কাজের বোঝা বাড়তে থেকেছে এবং আইনের শাস্তিমূলক ধারাগুলো কঠোর হস্তে প্রয়োগ করা হয়েছে। এ রাজ্যের ঐতিহ্য মেনে বহু বাগান মালিক নিয়মিত প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা জমা দেন না। টি বোর্ড পর্যন্ত এ কথা স্বীকার করেছে যে বাগানের উন্নয়নের জন্য টি বোর্ডের দেওয়া অর্থ মালিকরা বাগানে বিনিয়োগ না করে ফাটকাবাজিতে লাগিয়েছে। চা বাগান থেকে বাইরের লোকেরা প্রভূত উপার্জন করে যাচ্ছেন অথচ বাগানের শ্রমিকরা বংশানুক্রমে কুলি আর অদক্ষ শ্রমিক হিসাবে পড়ে রয়েছেন।

কোন ধরনের সরকারী বিধিনিয়ম বা নিয়ন্ত্রণের অভাবে এই শিল্পে মজুরী ও সাধারণভাবে শ্রমিকদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। ন্যূনতম মজুরী চাইতে গেলেই মালিকরা রব তোলেন যে চা শিল্প সংকটে এবং তারা বাগান বন্ধ করতে বাধ্য হবেন। মোদ্দা কথা হল যে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় এই শিল্পের মালিকরা বেশ রসেবসেই আছেন। আসলে যারা সংকটে পিষ্ট তারা হলেন এই শিল্পের সাথে যুক্ত শ্রমিক ও তাদের পরিবার পরিজনেরা। দুটো বিষয়ের দিকে নজর দিলে এই শিল্পের শ্রমিকদের সামগ্রিক পরিস্থিতি দিনের আলোর মতন পরিষ্কার হয় যায়। এ শিল্পে কোন ঘোষিত ন্যূনতম মজুরী নেই। এবং শ্রমিকরা যেহেতু বাগানে থাকেন, তাদের বাসস্থান ও অন্যান্য মৌলিক বিষয় সুরক্ষিত রাখাকে

নিয়ন্ত্রণ করা হয় প্লান্টেশনস লেবার অ্যাক্ট ১৯৫১ অনুযায়ী। এই আইনের বলে শ্রমিকদের পাকা বাড়ি, স্বাস্থ্য পরিষেবা, ক্যান্টিন, ক্রেশ, শ্রমিকদের বাচ্চাদের শিক্ষার ব্যবস্থা, রেশন ও চা পাতা, শুকনো জ্বালানি কাঠ, পানীয় জল, মাতৃত্বকালীন সুযোগ সুবিধা, ইত্যাদি দেওয়ার কথা। কিন্তু, একে এই আইনের ফাঁকফোকর প্রচুর; এছাড়া মালিকরা এই আইনকে যথেচ্ছ বুড়ো আঙুল দেখিয়ে যত্রতত্র শ্রমিক শোষণ চালাচ্ছেন। সরকারের তরফ থেকেও এই আইনের ঠিকঠাক প্রয়োগের ব্যাপারে বিন্দুমাত্র উৎসাহ নেই।

এই শোষণের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার লক্ষ্যেও দার্জিলিং এর শ্রমিকরা গোর্খাল্যান্ডের স্বপ্ন দেখছেন। একদিকে হাড়ভাঙ্গা খাটুনি অন্যদিকে নিজভূমে দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষ হয়ে বেঁচে থাকার জ্বালা। গোর্খাল্যান্ড আন্দোলনে সবসময়েই শ্রমিকদের অংশগ্রহণ চোখে পড়ার মতন এবং এই আন্দোলনের সাথে সাথে শ্রমিকরাও পথে নেমেছেন ন্যূনতম মজুরীর দাবিতে। মালিকরা আর সরকার ছাড়া সবাই বোঝেন যে যেখানে রাজ্যের অসংগঠিত শিল্পে সরকার ঘোষিত সর্বনিম্ন মজুরী ২০৬ টাকা সেখানে চা বাগানের শ্রমিকরা কি করে এত কম পয়সা পান? আরও মজার ব্যাপার হল যে দেশের দারিদ্রসীমার নীচের জনগণকে অনিপুণ বা অর্দ্ধনিপুণ কাজ দিয়ে তাদের ক্রয়ক্ষমতার উন্নতিসাধন করার লক্ষ্যে চালু এনআরইজিএ-এর আওতায় ১০০ দিনের কাজের মজুরীও দৈনিক ১৮০ টাকা, সেখানে বিদেশী মুদ্রা অর্জন করে এমন একটি শিল্পের শ্রমিকরা কি করে অর্ধাহারে-অনাহারে থাকার মতন কোন একটা মজুরী পেয়ে যুগের পর যুগ গাধার খাটনি খাটতে বাধ্য হন। এর ফলে বাগানগুলো থেকে মানুষ বাইরে চলে যাচ্ছেন জীবিকার সন্ধানে। পাহাড়ের বাগানগুলোতে বর্তমানে অনুপস্থিতির হার ৪০ শতাংশ। যারা পড়ে আছেন তারা কোনক্রমে লড়াই করে যাচ্ছেন বেঁচে থাকার তাগিদে।

কেন বামপন্থীরা এই লড়াইতে থাকবেন?

গোর্খাল্যান্ডের আন্দোলন নিয়ে কোনরকমের উপসংহার টানার আগে একথা মাথায় রাখতে হবে যে আন্দোলনের নেতৃত্ব যেই হোক না কেন এই লড়াই ঐ অঞ্চলের মানুষের দীর্ঘদিনের বঞ্চনার বিরূদ্ধে এক ধরনের অভিব্যক্তি। যেহেতু সাধারণ মানুষ মনে করেন যে তারা বাঙ্গালিদের দ্বারা অবদমিত সেহেতু তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবিতে আন্দোলন অবশ্যই গণতান্ত্রিক ও ন্যায্য। জাতিসত্তা কতটা বাস্তবিক বা কতটা কল্পিত সে অন্য কথা। প্রাথমিকভাবে আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে পাহাড়ের মানুষ অবশ্যই গণতান্ত্রিক দাবিতে লড়ছেন। এবং সেই কারণেই এই লড়াইয়ে এবং আন্দোলনের সমর্থনে বামপন্থীদের আরও বেশি বেশি করে পথে নামা দরকার। বামপন্থীরা যদি এই লড়াইতে না থাকেন তাহলে এর শ্রেণীগত উপাদান হারিয়ে গিয়ে এমন এক অসুস্থ উগ্র-জাতীয়তাবাদী প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে উঠবে যেখানে বাঙ্গালি আর নেপালি শ্রমিক পরস্পরের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে। জাতিগত কলহ ও দাঙ্গার ফলে শ্রেণীগত ঐক্য ভীষণভাবে বিঘ্নিত হবে। আন্দোলনকে কেন্দ্র করে পুঁজিপতিদের স্বল্পকালীন অসুবিধা হলেও শ্রমিকদের মধ্যে অনৈক্য ও বিভেদ সৃষ্টি তাদের পক্ষে যাবে।

এই আন্দোলনকে প্রগতিশীল লক্ষ্যে নিয়ে যাওয়ার জন্যও এর শ্রেণীগত উপাদানকে শক্তিশালী করা দরকার। আমরা জানি যে এই আন্দোলনের নেতৃত্বে যারা আছেন তাদের মধ্যে অনেকেই এই লড়াইকে ব্যবহার করতে চান তাদের ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা সফল করার লক্ষ্যে দরকষাকষির মঞ্চ হিসাবে। কিন্তু যেহেতু মানুষের গণতান্ত্রিক আশা-আকাঙ্খা এর সাথে যুক্ত সেহেতু বিমল গুরুংদের নেতৃত্বের সীমাবদ্ধতা দেখিয়ে এই লড়াইকে সমর্থন না করা সঙ্কীর্ণতার পরিচয় হবে। একইসাথে আমরা একথাও ভুলব না যে জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার রাজনৈতিক প্রশ্ন বাদ দিয়ে শুধুমাত্র সাংস্কৃতিক প্রশ্ন হয়ে উঠলে নিপীড়িত জাতিসমূহ উগ্র বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের প্রভাবে পড়েন। এর ফলে তারা মোহাচ্ছন্ন থাকেন, বোকা বনেন ও তাদের ঐক্য লোপ পায় যার সুবিধা নিয়ে বুর্জোয়ারা তাদের নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাতে পারে। এর প্রত্যক্ষ উদাহরণ দার্জিলিং যেখানে এই আন্দোলনের নেতৃত্ব ফ্যাসিস্টদের সাথেও ঐক্য স্থাপন করেন গোর্খাল্যান্ড হাসিল করার স্বপ্ন বেচে। কিন্তু এই পরিস্থিতে আমাদের করণীয় কী? দৃঢ়কণ্ঠে এই ধরণের আঁতাতের বিরোধিতা করে প্রয়োজনে এই নেতৃত্বকে ছুঁড়ে ফেলার ডাক দিতে হবে। কিন্তু এই ছুঁড়ে ফেলা তখনই সম্ভব যখন এই আন্দোলনের নেতৃত্ব শ্রমিকশ্রেণীর হাতে থাকবে। ঠিক এই জায়গাতে দার্জিলিং এর চা শ্রমিক ও অন্যান্য শ্রমিক এবং তাদের সচেতন নেতৃত্ব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে।

আত্মনিয়ন্ত্রণের লড়াইগুলো থেকে আমরা এই শিক্ষা নিই যে জনগোষ্ঠী বা জাতি শুধুমাত্র কোন বিমূর্ত ধারণা নয়। এর বিষয়ীগত উপদান, যেমন জাতিসত্তার চেতনা, জাতিসত্তার রাজনৈতিক লড়াই, ইত্যাদি খুব গুরত্বপূর্ণ। এই চেতনা এবং লড়াইয়ের অভিজ্ঞতার মধ্যে শ্রেণী চেতনাও মিশ্রিত থাকে। বামপন্থীদের দায়িত্ব একে আরও বিকশিত করা। এই কারণেই এই লড়াইয়ে শ্রমিক শ্রেণীর অংশগ্রহণ ও নেতৃত্ব খুবই জরুরী।